বাংলাদেশ : ২০১১ ইতিনেতির আইসিটি

সময়ের রথে চড়ে আমরা পেছনে ফেলে এলাম ২০১১। পা রাখলাম নতুন বছর ২০১২-য়। কেমন ছিল গেল বছর, কেমন হবে এলো বছর? সে হিসেব কষাই এখন চলছে সবখানে। আমাদের কাজকারবার আইসিটি নিয়ে। অতএব আমাদের যাবতীয় আগ্রহ এই আইসিটির ওপর। তাই আমাদের সামনে এখন আইসিটির হালখাতা। সে খাতা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে বিদায়ী বছরটিতে আমাদের জন্য যেমনি ছিল কিছু সাফল্য, তেমনি ছিল কিছু ব্যর্থতাও। সবকিছু মিলিয়ে আইসিটির জন্য ২০১১ যেমনি ছিল ইতিবাচক, তেমনি নেতিবাচকও। সেজন্য এ বছরটিকে আমরা চিহ্নিত করেছি আইসিটির জন্য ইতিনেতির একটি বছর হিসেবে। এ লেখায় রয়েছে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়া ইতিনেতির একটি আইসিটিচিত্র। এ চিত্রসূত্রে আমরা সুযোগ পাব আত্মসমালোচনার, সেই সাথে আত্মশুদ্ধির। সে প্রত্যাশায়ই বক্ষ্যমাণ এ প্রতিবেদন প্রয়াস।

গোলাপ মুনীর

আউটসোর্সিংয়ে সেরা ত্রিশে বাংলাদেশ

২০১১ সালটির শুরুতেই আমরা জানতে পারি, আমাদের আইসিটি খাতের একটি আশা জাগানিয়া সুখবরের কথা। খবরের সারকথা হচ্ছে– আউটসোর্সিংয়ের জগতে বাংলাদেশ সেরা ত্রিশ দেশের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক বৈদেশিক শ্রমবাজার হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বসেরা ৩০টি দেশের অন্যতম একটি দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও জরিপ প্রতিষ্ঠান গার্টনারের প্রকাশিত এক রিপোর্টে তখন বিশ্বসেরা যে ত্রিশটি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়, তাতে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্থান করে নেয়। এ তালিকা থেকে বাদ পড়ে ৭টি উন্নত দেশ। বাদ পড়া এসব দেশ হচ্ছে : অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও স্পেন। এই বাদ পড়া দেশগুলোর স্থানে নতুন জায়গা করে নিয়েছে ৮টি দেশ। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

প্রথমবারের মতো এই সেরা ত্রিশ আউটসোর্সিং দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান করে নেয়া নিশ্চিতভাবেই আমাদের জন্য উল্লেখযোগ্য এক উত্তরণ। সেই সাথে বিষয়টি আত্মসমালোচনারও। কারণ গার্টনারের রিপোর্টের দিকে তাকালে দেখা যায়– আউটসোর্সিং দেশের গ্রেডিং নির্ণয়ের জন্য ১০টি মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছিল : ভাষা, সরকারি সহায়তা, লেবার পুল বা শ্রমিক সংখ্যা, অবকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা, খরচ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক সহনশীলতা, বৈশ্বিক ও আইনি পরিপক্বতা এবং ডাটা, মেধাসম্পদ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা। এসব ক্রাইটেরিয়া বা মাপকাঠি বিবেচনায় ৫টি রেটিং স্কেল পুওর, ফেয়ার, গুড, ভেরি গুড এবং এক্সেলেন্ট ধরা হয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব মাপকাঠি রেটিং করতে গিয়ে দেখা গেছে– ভাষা, অবকাঠামো, ডাটা ও মেধাসম্পদ এবং নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পুওর। খরচের ক্ষেত্রে ভেরি গুড, অন্যান্য ৬টি ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান ফেয়ার অর্থাৎ মোটামুটি। অতএব যেসব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পুওর বা ফেয়ার সে অবস্থান থেকে আমাদেরকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে হবে আত্মসমালোচনার মনোভাব নিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশের সবখানে চিকিৎসাসেবা পৌঁছানোর জন্য আইসিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম। প্রযুক্তির সুবাদে এখন প্রাণঘাতী রোগ থেকে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সরকার চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যেকার দূরত্ব কমানোর ব্যাপারে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১১ সালে দেয়া হয়েছে সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড। গত অক্টোবরে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন তথা আইটিইউ'র মহাসচিব হামাদুন তুরে নিউইয়র্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। এ বছর এ পুরস্কারের থিম বা মৌলধারণা ছিল 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'। শেখ হাসিনাকে এ বছর এ পুরস্কার দেয়া হয় শিশু ও নারীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে আইসিটির ব্যবহারের উদ্ভাবনী ধারণার জন্য। এই পুরস্কার হাতে পেয়ে তিনি বলেন, এ সম্মান তার নয়, বরং এ সম্মান বাংলাদেশের জনগণের। তিনি বলেন, তার সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে এক দশকের মধ্যে হালনাগাদ আইসিটি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপ দিতে। এজন্য দেশের ৪৫০০টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সুবিধা সৃষ্টি করেছে। এবং সারা দেশের ১১০০ কমিউনিটি ক্লিনিককে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ সফল ইমাজিন কাপেও

মাইক্রোসফটের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজন করা হয় 'ইমাজিন কাপ প্রতিযোগিতা'। বাংলাদেশ ২০১০ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে 'আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ'-এর প্রতিযোগী দল 'টিম র‌্যাম্পার' এবারে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে 'পিপল চয়েজ' বিভাগে শীর্ষ পুরস্কারটি জিতে নিয়েছে। ২০১১ সালে এটি ছিল আইসিটি খাতে আমাদের জন্য একটি অনন্য আনন্দের খবর।

উল্লেখ্য, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্য হচ্ছে : দরিদ্রতা ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি, প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্তি, ম্যালেরিয়াসহ জীবননাশী রোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের উন্নয়ন। এই আটটি বিষয় মাথায় রেখে ইমাজিন কাপ প্রতিযোগিতার জন্য সফটওয়্যার তৈরি করতে হয়।

প্রোগ্রামিংয়ে বাংলাদেশ শীর্ষে

২০১১ সালে আমাদের জন্য আরেকটি সুখবর হচ্ছে– গত এপ্রিলের দিকে স্পেনের ভ্যালাডোলিড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ভ্যালাডোলিড অনলাইন জাজ সাইটে (http://uva.onlinejudge.org) অনুষ্ঠিত 'মেক্সিকো অক্সিডেন্টাল অ্যান্ড প্যাসিফিক ২০১০' শীর্ষক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থান পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় ৯টি সমস্যার সব ক'টি সমাধান করে প্রথম স্থান অর্জন করেন বাংলাদেশের আরিফুজ্জামান ও সোহেল হাফিজ। সাতটি সমস্যার সমাধান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজোন্যান্স দল দশম এবং প্রাইম দল ত্রয়োদশ স্থান পায়। পাঁচটি সমস্যার সমাধান করে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলুমিনেট দল ২৬তম ও নক্সিন দল পায় ২৮তম স্থান। আরিফুজ্জামান ও সোহেল হাফিজ উভয়ই ২০০৮ সালে এসিএম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় তথা আইসিপিসির চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেন। সোহেল হাফিজ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করছেন। আর সফটওয়্যার প্রকৌশলী আরিফ কর্মরত আছেন গুগলের মাউন্টভিউ অফিসে।

একই সময়ে জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়েচে ভেলের সেরা ব্লগ অনুসন্ধান প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়ে সাবরিনা সুলতানা 'সেরা ব্লগ' বিভাগে দ্বিতীয় হন। চট্টগ্রামের মেয়ে সাবরিনা একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। তিনি মাসকুলার ▸

ডিসট্রফি রোগের শিকার। সাবরিনার ব্লগের নাম sabrina.amarblog.com। তার ব্লগকে পেছনে ফেলে বেস্টব্লগ পুরস্কার পেয়েছে তিউনিসিয়ার মেয়ে লিনার ব্লগ 'এ তিউনেসিয়ান গার্ল'। সাবরিনা প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায় ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশি সিস্টেমস চেঞ্জ অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক' তথা বি-স্ক্যান নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

বাংলা ব্লগ

২০১১ সালে বাংলাদেশের সামাজিক ও যোগাযোগ মাধ্যমে 'ব্লগ' শব্দটি ছিল একটি বহুল আলোচিত শব্দ। এই বছরটিতে বর্ধিত হারে ব্লগ এ দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিদায়ী বছরটিতে বাংলাদেশের ব্লগারেরা বিশ্বব্যাপী নিউজ ব্রেকিং, শেপিং ও স্পিনিংয়ের ক্ষেত্রে নবতর ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশেও ব্লগকে বিবেচনা করা হচ্ছে সামাজিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী বিকল্প শক্তি হিসেবে। কারণ বাংলাদেশের ব্লগারেরা দেখেছে, এই মাধ্যমটি আরব দুনিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের আন্দোলন থেকে শুরু করে ওয়াল স্ট্রিটবিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত নানা আন্দোলনে কত বড় মাপের ভূমিকাই না পালন করে চলেছে।

বিগতপ্রায় বছরটির দিকে ফিরে তাকালে মনে হয় ব্লগিং, বিশেষত বাংলা ব্লগিং বাংলাদেশে এর যথাযোগ্য একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর somewhereinblog.net-এর উদ্যোগের সূত্রে বাংলা ব্লগিংয়ের অভিযাত্রা শুরু করে। এর ছয় বছর পর আজ বাংলাদেশে দেড় লাখ বাংলা ব্লগার সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের ব্লগারেরা ১৯ ডিসেম্বর দিনটিকে পালন করতে শুরু করেছে 'বাংলা ব্লগ দিবস' হিসেবে। এবার তৃতীয় ব্লগ দিবস পালনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরিতে। এবারে ব্লগ দিবসের স্লোগান ছিল : 'social media in mass awareness and cyber law– গণসচেতনতায় সামাজিক মাধ্যম ও সাইবার আইন'। তেরোটি কমিউনিটি ব্লগ ও ফোরাম প্লাটফরম এই আয়োজনে অংশ নেয়। এর মধ্যে ছিল : প্রথম আলো ব্লগ, বিডিনিউজ২৪ ব্লগ, প্রজন্ম ফোরাম ব্লগ, সামহোয়ারইন ব্লগ, টেকটিউনস ব্লগ, প্রিয় ডট কম, কমজগৎ ডট কম, একুশে ব্লগ, দৃষ্টিপাত, মুক্তব্লগ, উন্মোচন, ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র এবং বাংলানিউজ২৪।

আইটিইউ'র মহাসচিব হামাদুন তুরের কাছ থেকে সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জেলা ই-সেবাকেন্দ্র ও জাতীয় ই-তথ্যকোষ

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও জাতীয় ই-তথ্যকোষ এ সরকারের দু'টি উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল উদ্যোগ। জেলা ই-সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষ দুইশ'রেরও বেশি সেবা পাচ্ছে। এসব সেবা পেতে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনের সময় আবেদনকারী একটি রসিদ নম্বর পান। সেবাটি কবে তিনি পাবেন, তা তিনি জানতে পারেন অনলাইনের মাধ্যমেই। তবে সেবাটি অনেক সময় নির্ধারিত সময়ের আগেও গ্রাহক পেয়ে যাচ্ছেন জেলা পরিষদ থেকে, এমন উদাহরণের কথা জানা গেছে। তা ছাড়া অনলাইনে রসিদ নম্বর দিয়ে তার আবেদনের অবস্থা বা স্ট্যাটাস জেনে নেয়া যায়। গত নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এ সেবাকর্মের উদ্বোধন করেন।

অপরদিকে জাতীয় ই-তথ্যকোষ মূলত সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্যের ভাণ্ডার। এ তথ্যভাণ্ডারে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, অকৃষি উদ্যোগ, পর্যটন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার হাজারেরও বেশি নিবন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প এই ই-তথ্যকোষ বাস্তবায়ন করে। তথ্যগুলোকে ওয়েব (এইচটিএমএল), ডকুমেন্টস (পিডিএফ), চিত্র, অডিও, ভিডিও ও অ্যানিমেশন আকারে দেয়া আছে। ব্যবহারকারীরা যেকোনো ফরমেটের কনটেন্ট খুঁজে নিতে পারেন ওয়েবের (www.infokosh.bangladesh.gov.bd) মাধ্যমে। বর্তমানে জাতীয় ই-তথ্যকোষে আটটি বিষয়ে নব্বই হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠার তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

দেশী ব্র্যান্ডের দোয়েল ল্যাপটপ

২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ জুলাইয়ে আমাদের দেশী ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ 'দোয়েল' উৎপাদন শুরু হয়। বাংলাদেশে এখন টেলিফোন শিল্প সংস্থা তথা টেশিসের তত্ত্বাবধানে চার ধরনের দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন হচ্ছে। এসব ল্যাপটপের দামে ও মানে পার্থক্য রয়েছে। এসব ল্যাপটপের সর্বনিম্ন দাম দশ হাজার টাকা। ১০ ইঞ্চি সাইজের এর মেমরি ৫১২ মেগাবাইট। এতে ওয়েবক্যাম থাকলেও ব্লুটুথ ব্যবহারের সুযোগ নেই। এর হার্ডডিস্ক ১৬০ গিগাবাইটের। স্কুল শিক্ষার্থীরা এটি ব্যবহার করে অনায়াসে তাদের কাজ করতে পারবে। দুই ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপের এ ল্যাপটপের ওজন এক কেজি। এ ছাড়া আরো তিনটি ভিন্ন দাম ও মানের ল্যাপটপ উৎপাদন করছে টেশিস। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও মান প্রথমটির চেয়ে অনেক উন্নত। এগুলোতে আছে দ্রুতগতির ব্লুটুথ। থাকবে ওয়েবক্যামসহ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন মেমরি কার্ড। ২৩ হাজার টাকা দামের এ ল্যাপটপ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে। এ ল্যাপটপ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে মালয়েশিয়ার টিএফটি টেকনোলজিস। ল্যাপটপগুলো পাওয়া যাবে ১০, ১২, ২১ ও ২৫ হাজার টাকায়।

বলা বাহুল্য, ছাত্রদের ব্যবহারের ভাবনা মাথায় রেখে এই ল্যাপটপগুলো উৎপাদিত হলেও দাম আরো না কমালে অনেক ছাত্রই তা ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

বছরের আলোচিত মেলা ই-এশিয়া ২০১১

বাংলাদেশে বিদায়ী বছরের আলোচিত তথ্যপ্রযুক্তি মেলা ছিল 'ই-এশিয়া ২০১১'। 'রিয়েলাইজিং ডিজিটাল ন্যাশন' স্লোগান নিয়ে ১-৩ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই আন্তর্জাতিক আইসিটি উন্নয়নবিষয়ক মেলা। এ মেলায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশও তাদের নিজ নিজ দেশের আইসিটি খাতের সেবা, কর্মকাণ্ড ও ধারণা তুলে ধরার সুযোগ পায়। এই মেলা আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল একদিকে প্রযুক্তির সরবরাহ বাড়ানো, অন্যদিকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের উপায় অনুসন্ধান। এই মেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয় : জাতীয় দরিদ্রতা অবসানের হাতিয়ার হিসেবে মূলধারায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ►

করতে হবে; মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা যোগাতে হবে; পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নাগরিকসাধারণকে সক্ষম করে তুলতে হবে; আইসিটি ব্যবহার করে দরিদ্রতা কমানো ও মানব উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

এই মেলা কাজ করে আইসিটিবিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্ল্যাটফরম হিসেবে। এর মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো সফলতার সাথে বাংলাদেশের অর্জিত ডিজিটাল অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা যেমনি বাইরের দেশগুলোর সামনে তুলে ধরা গেছে, তেমনি অন্যদের অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানা গেছে। এ দিকটি বিবেচনায় ই-এশিয়া ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি অনন্য সুযোগ। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কথা মাথায় রেখে এবারের ই-এশিয়ার 'রিয়েলাইজিং ডিজিটাল ন্যাশন' স্লোগানের পাশাপাশি এমন পাঁচটি মৌলধারণা বা থিম নির্ধারণ করা হয়, যার চারটিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায়। সে দিক থেকে এবারের ই-এশিয়া বাংলাদেশের জন্য ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, ই-এশিয়া ২০১১-র থিমগুলো ছিল : বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন্স, ড্রাইভিং ইকোনমি ও ব্রেকিং ব্যারিয়ার। ই-এশিয়ার কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন ছিল এর উল্লেখযোগ্য এক দিক।

অনুমোদন পেল দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল

বছরের একদম শেষ প্রান্তে এসে সরকার অনুমোদন দিল দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের। দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিকে অনুমতি দিয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ সাবমেরিন কোম্পানি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, গত ২৭ ডিসেম্বর এই অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আগে গত ২৯ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে এ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব সুনীল কান্তি বোস কোম্পানিটির শেয়ারবাজারে আসার ঘোষণা দেয়ার সময় জানিয়েছিলেন, কোম্পানিটি আরো একটি সাবমেরিন ক্যাবল সি-মি-উই-৫-এর সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন সম্পর্কে তিনি জানান, এ বিষয়ে দরপত্র আহ্বান করলে মাত্র একটি কোম্পানি তাদের দরপত্র জমা দেয়। এ অবস্থায় ওই দরপত্র মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশের একমাত্র সাবমেরিন ক্যাবল সি-মি-উই-৪ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড। বর্তমানে চালু দেশের একমাত্র ক্যাবল সংযোগ কাটা পড়লে টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন হয়। নতুন অনুমোদন দেয়া এই সাবমেরিন ক্যাবলটির সাথে বাংলাদেশ সংযুক্ত হলে এ ধরনের সঙ্কট দূর হওয়ার পাশাপাশি দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও ভয়েস সেবা যোগানো সহজতর হবে। তাই প্রযুক্তিপ্রেমীরা এই অনুমোদনকে সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে।

ডট বাংলার অনুমোদন

বিদায়ী বছর ২০১১-র মার্চের দিকে এসে ইন্টারনেটে বাংলাদেশের ওয়েবসাইটগুলোর পরিচিতিমূলক ডোমেইন নাম 'ডট (.) বাংলা'-র অনুমোদন পায় বাংলাদেশ। ওয়েব ঠিকানা বরাদ্দদাতা প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারনেট করপোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বার্স' তথা আইসিএএনএন এই অনুমোদন দেয়। আইসিএএনএন ইন্টারন্যাশনালাইজড ডোমেইন নেম তথা আইডিএন হিসেবে ডট বাংলার প্রথম পর্যায়ের অনুমোদন দিল। এর ফলে বাংলা বর্ণমালায় ওয়েবসাইটে ঠিকানা লেখা সম্ভব হবে। এখন সরকারি উদ্যোগে আইসিএএএনের অঙ্গসংস্থা অ্যাসাইনড নাম্বার্স অথরিটির কাছে আবেদন করার পর বাংলাদেশের কোনো সংস্থা ডট বাংলা বরাদ্দ করতে পারবে।

ঝুঁকিতে থেকে গেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং

এবার রেগুলেটর তথা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দেয়া পদক্ষেপের কারণে পিছিয়ে পড়েছে মোবাইল অপারেটরদের সাথে অন্য সার্ভিস প্রোভাইডারদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং বিজনেস। রেগুলেটরের একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মোবাইল অপারেটরদের এখন থেকে তাদের নেটওয়ার্ক শেয়ার করতে হবে একটি অভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। তা ছাড়া মোবাইল অপারেটরেরা এসব ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় করতে পারবে না, যেখানে অভিন্ন নেটওয়ার্ক-ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশনস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন)-এর কভারেজ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এখন দু'টি কোম্পানি- ফাইবার অ্যাটহোম ও সামিট কমিউনিকেশনসের রয়েছে অভিন্ন নেটওয়ার্কের আওতায় সেবা যোগানোর এনটিটিএন লাইসেন্স। কিন্তু এই নেটওয়ার্কের সীমিত কভারেজ রয়েছে। এখন যদি কোনো মোবাইল কোম্পানি কিংবা অন্য কোনো সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা ভাড়া দিতে চায়, তা হলে প্রথমে ভাড়া দিতে হবে দু'টি এনটিটিএন লাইসেন্সধারীর কাছে। এরপর এই এনটিটিএন লাইসেন্সধারীরা তা ভাড়া দেবে অন্য সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে। সার্ভিস প্রোভাইডারদের অভিযোগ, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এককভাবে এবং তা মোবাইল অপারেটরদের ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন তথা বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জিয়া আহমেদ বলেছেন, কমিশন এ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বিধি সংশোধন করতে যাচ্ছে। বিটিআরসি কর্মকর্তারা বলছেন, বিটিআরসির উদ্যোগের লক্ষ্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা।

২০০৮ সালের পর থেকে এনটিটিএন লাইসেন্সধারী দুই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে, সারাদেশে ভূগর্ভস্থ ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসিয়ে তা অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে লিজ দেয়া। কিন্তু এরা শুধু ঢাকায় তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পেরেছে। আর ফাইবার অ্যাটহোম অন্য অপারেটরদের কাছ থেকে অবকাঠামো ভাড়া নিয়ে ঢাকার বাইরে কিছুটা সক্ষমতা গড়ে তুলেছে। অপরদিকে, মোবাইল অপারেটরেরা এরই মধ্যে সারাদেশে ৪০ কোটি ডলার ব্যয়ে ফাইবার অপটিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। মোবাইল অপারেটরদের কথা হচ্ছে, যদি ট্রান্সমিশন অবকাঠামো একটি মাত্র কোম্পানির মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়, তবে তাদের রিসোর্স অকেজো হয়ে পড়বে। টেলিকম অপারেটরেরা আরো বলছে, যেহেতু অবকাঠামো শুধু এনটিটিএন অপারেটরদের কাছেই ভাড়া দিতে হবে, সেহেতু তাদের বিপুল ক্যাপাসিটি অব্যবহৃত থেকে যাবে। প্রান্তিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের খরচও বেড়ে যাবে। কারণ, এনটিটিএন অপারেটরেরা প্রথমে অবকাঠামো অন্যের কাছ থেকে ভাড়া নেবে, এরপর তা আবার সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে ভাড়া দেবে।

বিটিআরসি চেয়ারম্যানের কথা হচ্ছে, যদি এনটিটিএন অপারেটরেরা সেবা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে মোবাইল অপারেটরদের অনুমতি দেয়া হবে অন্য সেবাদাতাদের সাথে ট্রান্সমিশন শেয়ার করার জন্য। এদিকে সামিট কমিউনিকেশন বলছে, সারাদেশে নেটওয়ার্ক রাতারাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দেশে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি চালু হলে প্রচুর ব্যান্ডউইডথের চাহিদা সৃষ্টি হবে, তখন একটি অভিন্ন অবকাঠামো সহায়ক হবে। শেষ পর্যন্ত বর্তমান রেগুলেশন সবার জন্যই ভালো হবে। ফাইবার অ্যাটহোম বলছে, এরা দ্রুত এদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। তাদের গ্রাহকদের সেবা দিতে কোনো অসুবিধা হবে না। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারেরা বলছে, এরা এনটিটিএন নেটওয়ার্কে সুইচ করতে চায় না। কারণ তাদের আশঙ্কা, এই নেটওয়ার্ক তাদের চাহিদামতো সেবা দিতে পারবে না। ঢাকার বাইরে এনটিটিএনের সেবা সীমিত। তাই ইন্টারনেট সেবাদাতারা এনটিটিএন নেটওয়ার্কে যদি ঢোকেও, তবে তাদের অবকাঠামো উন্নয়নে আরো বিনিয়োগ করতে হবে।

টেলিকম লাইসেন্স নবায়নে কাটেনি স্থবিরতা

টেলিকম অপারেটর ও রেগুলেটরের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন নিয়ে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের অবসান ছাড়াই বিদায় নিলো ২০১১। টেলিকম লাইসেন্স নবায়নের ব্যাপারে অচলাবস্থা না কাটায় ক্ষুব্ধ টেলিকম অপারেটর কোম্পানিগুলো। অথচ গত ১০ নভেম্বর টেলিকম লাইসেন্স নবায়ন হওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, চার মোবাইল ফোন কোম্পানি- গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি ও সিটিসেলের লাইসেন্সের মেয়াদ গত ১০ নভেম্বর শেষ হয়ে গেছে। লাইসেন্স নবায়নে বিলম্ব ঘটার ফলে টেলিকম অপারেটরেরা নতুন পণ্য চালু করার পেছনে বিনিয়োগ বন্ধ রেখেছে। অপারেটরেরা ►

লাইসেন্স দেখিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিতে পারছে না। উল্লেখ্য, মোবাইল কোম্পানিগুলো ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েই লাইসেন্স নবায়নের ফি পরিশোধ করে থাকে। বর্তমানে এসব কোম্পানি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন তথা বিটিআরসির এক আদেশবলে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

মূল্য সংযোজন কর দেয়ার বিতর্কিত বিষয়টি এখন হাইকোর্টে মুলতবী রয়েছে। বিটিআরসি কর্মকর্তার মতে, মূল্য সংযোজনের বিষয়টি রাজস্ব ভাগাভাগি ও লাইসেন্স ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এর প্রভাব পড়বে বিটিআরসির ৯০০ লাইসেন্সের ওপর। চারটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি বিটিআরসির কাছে গত নভেম্বরে সর্বমোট পরিশোধ করেছে ৩,১৮৫ কোটি টাকা, যা লাইসেন্স নবায়ন ও স্পেকট্রাম চার্জের ৪৯ শতাংশ। বিটিআরসি এরই মধ্যে এই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। বিটিআরসি ২০০৮ সালে অতিরিক্ত স্পেকট্রাম ব্যবহারের জন্য গ্রামীণফোনের কাছে ২৩৬ কোটি টাকা এবং বাংলালিংকের কাছে ৪৭ কোটি টাকা দাবি করেছে। এই দুই কোম্পানি এই অতিরিক্ত অর্থ দিতে অস্বীকার করে বলেছে, বিষয়টি ২০০৮ সালেই মীমাংসা করা হয়েছে। কিন্তু বিটিআরসি এর দাবিতে অনড়। এর ফলে অপারেটরেরা বিষয়টি আদালতে নিয়ে যায়। এই লেখা তৈরি করার সময় পর্যন্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। সংশ্লিষ্টরা চাইছেন, সরকার টেলিকম শিল্পের সার্বিক স্বার্থে বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি হোক।

এদিকে সিটিসেলের প্রধান নির্বাহী মাহবুব চৌধুরী বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ শিল্পে মার্জার, একুইজিশন ও লিকুইডেশনের ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ তার মতে, বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি বাজারে বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬টি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি টিকে থাকা সম্ভব নয়। তার ধারণা, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মোবাইল কোম্পানির সংখ্যা কমে যাবে। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রয়োজনে সরকার চায় দেশের প্রতিটি জেলায় ফাইবার অপটিক কানেকশনের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ব্যবহার সম্প্রসারণ করতে। কিন্তু ফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য মূলধন ব্যয় খুবই বেশি। মোবাইল অপারেটরেরা এরই মধ্যে দেশের সবখানে পৌঁছে গেছে। তারবিহীন মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কানেকশন দ্রুত সরবরাহ করা সম্ভব।

সুরাহা হয়নি আন্তর্জাতিক গেটওয়ে লাইসেন্স

এদিকে ইন্টারনেট ও টেলিফোনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য গেটওয়ে লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি সুরাহা করার আগে বিলম্ব নিল আরো একটি বছর। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসির ডাকা দরপত্রে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে লাইসেন্সের জন্য জমা পড়েছে ১৫৩ টি দরপত্র। এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে বা আইজিডব্লিউ ৪৩টি, ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে বা আইআইজিডব্লিউ ৫৯টি এবং ইন্টারন্যাশনাল কানেকশন এক্সচেঞ্জ বা আইসিএক্স ৫১টি। কিন্তু একটি জাতীয় দৈনিক জানিয়েছে, এসব দরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শেষ না করেই আন্তর্জাতিক গেটওয়ে লাইসেন্স কাকে দেয়া হবে, সরকার সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই পত্রিকাটি জানিয়েছে, এবারের লাইসেন্সগুলো মূলত 'রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে' দেয়া হবে। তবে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ সে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এদিকে জানা গেছে, ইতোমধ্যে আইটিসি লাইসেন্সপ্রাপ্তরা কেউই এই লাইসেন্স নিতে রাজি হচ্ছে না। এরা আইটিসির পাশাপাশি আইআইজি লাইসেন্সও চাইছে। এদের বক্তব্য, আইটিসি লাইসেন্সের জন্য মনোনয়ন পাওয়া ম্যাংগো টেলিসার্ভিসের ইতোমধ্যেই আইআইজি লাইসেন্স ও অবকাঠামো রয়েছে। ম্যাংগোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হলে বাকিদেরও আইআইজি লাইসেন্স প্রয়োজন। অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি আইটিসি লাইসেন্সের নীতিমালা ভেঙ্গে সরকার তিনটির জায়গায় ৬টি লাইসেন্স দেয়। বিটিআরসির অভিযোগ এ ব্যাপারে তাদের কোনো যুক্তি শুনতে রাজি হয়নি মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন সূত্রমতে, মন্ত্রণালয়ের চাপে বাধ্য হয়ে তিনটির জায়গায় ছয়টি লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, আইজিডব্লিউ, আইআইজিডব্লিউ ও আইসিএক্সের পাশাপাশি ভিএসপি তথা ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার নামের আরেক ধরনের লাইসেন্স দিতে যাচ্ছে সরকার। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ, মূলত অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ের সাথে রাজনৈতিক নেতাসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবসায়কে বৈধ করার জন্যই এ উদ্যোগ। তবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ভিওআইপি প্রযুক্তিটি উন্মুক্ত বলে এ ধরনের লাইসেন্স ব্যবস্থা বিশ্বের কোনো দেশে নেই।

বাংলাদেশের দুই ধাপ পিছিয়ে পড়া

এটা কারো অজানা নয়, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে আজ ক্ষমতায় আসীন। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সড়কপথে হেঁটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে দেশকে প্রথমে একটি মধ্যম আয়ের দেশে, তারও পরে একটি উন্নত দেশে রূপ দেয়াই ছিল সরকারে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত লক্ষ্য। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া নিয়ে হইচইও কম হয়নি সরকারের এই তিন বছরে। আর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। অতএব স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল, বর্তমান সরকারের আমলে আগের যেকোনো সরকারের আমলের তুলনায় তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গতি আসবে। কিন্তু এ সরকারের প্রায় তিন বছর শাসনের শেষ দিকে এসে ২০১১ সালের নভেম্বরে দিকে মানুষ জানল, বিশ্বের তুলনামূলক তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের প্রবৃদ্ধিহারে বাংলাদেশ এ সরকারের আমলে দুই ধাপ পিছিয়ে গেছে। আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তথা আইডিআই অনুযায়ী বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৩৭তম স্থানে। ২০০৮ সালে তা ছিল ১৩৫তম স্থানে। অতএব এই তিন বছরে আমাদের অবস্থান দুই ধাপ পিছিয়েছে। এটুকু জেনে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা হোঁচট খায় বৈ কি! তা ছাড়া এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আমাদের স্বপ্নভঙ্গেরও কারণ হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তখন সংশয় জাগে, আমরা কি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহাসড়ক ছেড়ে কোনো ভুল সড়কপথে হাঁটছি?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপত্তির মুখে টেলিট্রানজিট

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপত্তির মুখে এবার ভারতকে দেয়া হচ্ছে টেলিট্রানজিট। যদিও এর আগে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে বারবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়। এবার সরকারের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কোনো কারণে সাবমেরিন ক্যাবলে সমস্যা হলে যাতে করে বাংলাদেশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, সে জন্যই ভারতকে এই টেলিট্রানজিট দেয়া হচ্ছে। ভারত এর মাধ্যমে এর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সাতটি অঙ্গরাজ্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছাতে চায়। জানা গেছে, এরই মধ্যে ছয়টি কোম্পানিকে এ ব্যাপারে আইটিসি লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে আমাদের ডাক ও তার মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন তথা বিটিআরসি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। ২০১২ সালের শুরুতেই এ লাইসেন্স পাওয়ার পর এ কোম্পানিগুলো কাজ শুরু করবে। শুধু ভারতীয় কোম্পানিগুলোর সাথে যারা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে, তাদেরকেই এ লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। এই কোম্পানিগুলো ব্যান্ডউইডথের জন্য ভারতের টাটা ও এয়ারটেলের সাথে চুক্তি করেছে। এরা বেনাপোলের একটি ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে সেবা চালু করবে। ভারতের সরকারি কোম্পানি ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের সাথে বাংলাদেশের বিটিসিএলের একটি লিঙ্ক আগে থেকেই আছে। এই চুক্তি হয় গত ৯ নভেম্বর।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রমতে, একটি লিঙ্ক থাকার পর আবারো বেসরকারি উদ্যোগে লিঙ্ক স্থাপনের যে উদ্যোগ, তা দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এতে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা কঠিন হবে। এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে চার দফা আপত্তি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের ফাইবার অপটিক সংযোগ দেয়া-নেয়ার জন্য এয়ারটেলের ক্যাবল কোম্পানি আইটুআই'র সাথে যুক্ত হবে। আইটুআই'র সাথে বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল লিঙ্ক যুক্ত হলে সেভেন সিস্টার নামে খ্যাত ভারতীয় সাত রাজ্যে কম খরচে টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা দেয়া সম্ভব হবে। আর এ সুবিধাটি ভারত তাদের দেশীয় কোম্পানির মাধ্যমেই করতে চাইছে। কারণ, এদেশে ▸

এয়ারটেলের ব্যবসায় রয়েছে। এটি হলে এরা আরো বেশি সুবিধা পাবে।

জাতি পায়নি আইসিটি অনুকূল বাজেট

জাতির বরাবরের প্রত্যাশা একটি আইসিটি অনুকূল বাজেট। অব্যাহতভাবে জাতি তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালেও আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশকামী সরকারের কাছ থেকেও পাইনি একটি আইসিটি অনুকূল বাজেট। বর্তমান সরকার 'জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯'-সহ প্রণয়ন করেছে 'ভিশন ২০২১' বা 'রূপকল্প ২০২১'। আমাদের আইসিটি নীতিমালার ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু ও ৩০৬টি করণীয় রয়েছে। উল্লিখিত রূপকল্পে যেসব আরাধ্য কাজের কথা বলা আছে, তার মধ্যে আছে– তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং আইসিটির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বাড়ানো, সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সুলভে জনসেবা যোগানো নিশ্চিত করা, ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও ৩০ বছরের মধ্যে উন্নত দেশে রূপ দেয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করা। জাতীয় আইসিটি নীতিমালার দশটি উদ্দেশ্য হচ্ছে– সামাজিক সমতা, উৎপাদনশীলতা, অখণ্ডতা, শিক্ষা ও গবেষণা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, তথ্যজগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, পরিবেশ জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি সহায়তা দেয়া। কিন্তু এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ আসেনি ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে। এ দেশের আইসিটি খাতের তিন শীর্ষ সংগঠন বিসিএস, বেসিস ও আইএসপিএবি যৌথভাবে বাজেটে বাস্তবায়নের জন্য যে চারটি আয়কর প্রস্তাব, পাঁচটি ভ্যাট প্রস্তাব এবং দু'টি আমদানিবিষয়ক প্রস্তাব দিয়েছিল তা বাজেটে উপেক্ষিত হয়।

বাজেটোত্তর এক সংবাদ সম্মেলনে এই তিন সংগঠন অভিযোগ করে– বাজেটে আইসিটি নীতিমালার প্রতিফলন ঘটেনি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশব্যাপী ইন্টারনেটের বিস্তারের ওপর গুরুত্ব দিলেও বাজেটে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয় চারগুণ। জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় আইসিটি শিল্পোন্নয়ন তহবিল গঠনের লক্ষ্যে ৭০০ কোটি টাকার ১০ শতাংশ ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বাজেটে সে বরাদ্দ ছিল না। একই সাথে আইসিটি নীতিমালার ১৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইসিটি শিল্পোন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা ছিল। কিন্তু বাজেটে এর জন্য কোনো বরাদ্দ দেয়া হয়নি। সরকার কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক করলেও এর উন্নয়নে বাজেটে কোনো বরাদ্দ নেই। অন্যান্য শিল্পখাতের সাথে সফটওয়্যার ও আইসিটি খাতের কর অব্যাহতি ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অথচ আইসিটি নীতিমালায় এ সুবিধা ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর কথা। তাই বলতেই হয়, এবারো জাতি পায়নি প্রত্যাশিত আইসিটি অনুকূল একটি বাজেট।

আইসিটি মন্ত্রণালয়ে ভাঙাগড়ার খেলা

বিদায়ী বছরের শেষ দিকে এসে সরকার রেলওয়ে বিভাগকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে নতুন রেল মন্ত্রণালয় গঠন করে। একই সাথে 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' ভেঙে করা হয় দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয়। একটি 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'। অপরটি 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'। এ বিষয়ে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক আদেশে বলা হয়, রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬-এর ৩ নম্বর রুলের চতুর্থ ধারার ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রী এই নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করেন। এর পর মন্ত্রণালয়ের এ বিভাজন ও মন্ত্রিপরিষদে রদবদল নিয়ে সরকারের ভেতরে চলে নানা নাটকীয়তা। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, এই রদবদল প্রক্রিয়ায় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ছেন এতদিন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, প্রথমে তাকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দেয়া হলো। আবার রাতারাতি তাকে করা হলো তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর পদ্মা সেতুর প্রধান ঋণদাতা বিশ্বব্যাংক তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কমিশন বাণিজ্য এবং অবৈধ সুবিধা আদায় ও জালিয়াতির অভিযোগ এনে পদ্মা সেতুতে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত করে দেয়। বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের সাথে একমত প্রকাশ করে অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা এডিবি, জাইকা ও আইডিবি তাদের ঋণ বরাদ্দ স্থগিত করে দেয়। এ সময় অভিযুক্ত যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের পদত্যাগ দাবি করে দেশের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, নারীসমাজ, সরকার ও সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া গত ঈদুল আজহার সময় সারাদেশের প্রায় সব সড়ক-মহাসড়ক ও রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস-ট্রাক মালিকেরা বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ ঘোষণা করলে সর্বস্তরের মানুষ তার পদত্যাগ দাবি করে। বিষয়টি নিয়ে সরকারপক্ষ এক ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। কিন্তু মন্ত্রী আবুল হোসেন পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। প্রধানমন্ত্রী নিজেও অদৃশ্য কারণে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেননি। তবে তাকে করা হয় নবগঠিত তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। বিভিন্ন মহলের অভিমত, তাকে এই নতুন দায়িত্ব দেয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবুল হোসেনকে তার অতীত ব্যর্থতার জন্য তিরস্কারের বদলে পুরস্কৃতই করলেন। তা ছাড়া তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বোনাস পুরস্কার হিসেবে ইতোমধ্যেই প্রশাসনিক উন্নয়নবিষয়ক সচিব কমিটি মন্ত্রী আবুল হোসেনের অধীনে টেলিযোগাযোগ খাত দেয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এই রিপোর্ট তৈরি করা পর্যন্ত সময়ে সচিব কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জানিয়ে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। খবরে প্রকাশ, সচিব কমিটির এ সিদ্ধান্তে নাখোশ বর্তমান ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় অংশ টেলিযোগাযোগ খাতটি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের হাতে ছাড়তে নারাজ। কিন্তু তাতে তার শেষ রক্ষা যে হবে না, সে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। কারণ মন্ত্রণালয় সূত্রমতে, গত ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সচিব কমিটির বৈঠকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের 'ডাক' অংশটি কেটে 'ডাকসেবা মন্ত্রণালয়' এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে 'টেলিযোগাযোগ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে 'টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' করার কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনও করেছেন। আবুল হোসেনকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়ায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কারণ, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে তার কাজের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, এমনটি আগে শোনা যায়নি। শুধু দলীয় সমীকরণ সমাধানের বিবেচনা থেকে মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের ভাঙাগড়া জাতীয় স্বার্থের কতটুকু অনুকূলে যাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

যেতে হবে বহুদূর

আমাদের এখন যাবতীয় ভাবনা, যতসব হইচই–সবই ডিজিটাল বাংলাদেশকে ঘিরে। তাও এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সময়রেখা আমরা নির্ধারণ করেছি ২০২১ সালকে। সোজা কথায়, আমরা চাই বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করতে। কিন্তু অবাক হতে হয়, আমরা একটিবারও বলছি না– বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন একটি পুরনো বিষয়ে রূপ নিয়েছে, কিংবা রূপ নিতে শুরু করেছে। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এখন চলছে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি'-উত্তর 'হাইব্রিড প্রযুক্তি' নিয়ে। আমাদের নীতি-নির্ধারকদের কারো মুখ থেকে এখন পর্যন্ত এই হাইব্রিড বা সঙ্কর প্রযুক্তি শব্দটি একটিবারও উচ্চারণ হতে শুনিনি। এটি আমাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে দৈন্য বৈ কিছু নয়। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যার একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বসাম্প্রতিক এই সঙ্করযুগ বা হাইব্রিড এইজ সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করার প্রয়াস বলা যায় সর্বপ্রথম চালিয়েছে। আমরা আশা করব, আমাদের নীতি-নির্ধারকেরা সে প্রতিবেদনটি পড়ে দেখবেন এবং সেই সাথে এখন থেকে জাতিকে সেই হাইব্রিড যুগে উত্তরণের দিকে ধাবিত করার উদ্যোগ আয়োজনে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। নইলে শুধু 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামের ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমরা খুব বেশি এগিয়ে যেতে তো পারবই না, বরং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে আমাদের পিছিয়ে থাকা। এ উপলব্ধি না আসলে সামনে সমূহ বিপদ ইংরেজি নববর্ষের এই ক্ষণে এ তাগিদটুকুই রইল।